মধ্যভারত-পরিক্রমা

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—পৌষ, ১৩৭১

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
অজিত গুপ্ত

আট টাকা

বিবাগী ছেলে বাবলুকে—

এই সিরিজের পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ

ভারত-পথিক

মহারাষ্ট্র পরিক্রমা

পরবর্তী গ্রন্থাবলী প্রকাশিতব্য

এ কোন নদী?

গীয়ার বদলে ড্রাইভার বললে,—

ইয়ে হ্যয় চম্বল!

চলন্ত বাস থেকে দুধারের দৃশ্য দেখে দিনদুপুরেই মনটা কেমন ছমছম করছিল। এবার নাম শুনে বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল।

এই সেই চম্বল। নৃশংসতম দস্যুর আড্ডা যার দুপাশে। যাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী কল্পনাকে হার মানায়। যাদের প্রতাপে একদিন সারা মধ্যভারত থরথরিয়ে কেঁপেছিল।

পৌরাণিক যুগে এক বিরাট রাজা ছিলেন রন্তিদেব। যেমন বিত্তশালী তেমনি প্রজাপরায়ণ। যাগযজ্ঞ আর অতিথিসেবার জন্যে অতুলনীয় কীর্তির তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। প্রতিদিন হাজার হাজার পশুবলি দিতেন আর অন্নে মাংসে পরিতৃপ্ত করতেন হাজার হাজার রবাহূত অতিথিকে। সেই সমস্ত পশুর ক্লেদ আর রক্ত ঝরে ঝরে নদী বয়ে গেল। পশুচর্মের পাহাড় জমল নদীর দুই তীরে।

সে নদীর নাম চর্মন্বতী।

ডাকনাম চম্বল।

এমনি জন্মকাহিনী যে নদীর,—সে নদীর দুকূল ঘিরে হিংসা আর নৃশংসতার বন্যা বইবে না তো কী? সে নদীর দুই তীরে প্রকৃতি তো ভয়ঙ্করের পসরা সাজিয়ে থাকবেই। ঢোলপুরের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এখন ব্রীজের উপর থেকে এপার ওপারের দৃশ্য দেখে মনে হোলো ভয়ঙ্করের তুলনা নেই।

চোখ একেবারে চক্রবালকে গিয়ে ছুঁয়েছে। যতো দূরে চাই,—কোথাও একটি গাছ নেই, একটি লতা নেই। একটুকরো ছায়া নেই, নেই কোনো কুটীর, জনমানুষের কোনো চিহ্ন। তৃণবিহীন রুক্ষ শক্ত

গেরুয়া মাটি,—সারাদিনের সূর্যের আলো আর সারারাতের নিবিড় কালোর ঘা খেয়ে খেয়ে কোথাও কোথাও তামাটে কালশিরে। যন্ত্রণায় আর রাগে যেন গনগন করছে। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে, থরথর কাঁপছে। কোথাও যদি সবুজের ইশারাটুকু দেখা যায়, অমনি তাকে টুঁটি টিপে মারছে আর সেই বর্বর হিংসায় অট্টহাস্য করে উন্নতশির স্তম্ভের মতো আকাশের দিকে বজ্রমুষ্টি তুলছে।

উন্নত মুষ্টির মতো ছোট বড় অসংখ্য টিলা দাঁড়িয়ে আছে দিকচক্রবাল পর্যন্ত। রক্তিম তাদের মাথা, স্তম্ভের মত কঠোর তাদের দেহ। শত শত, হাজার হাজার, সামনে পিছনে, কাছে দূরে। একে অপরের গা ঘেঁষে, একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে। সমান্তরাল রেখায় নয়, কোনো ছন্দোবদ্ধতায় নয়। ভূপ্রকৃতির এমনি বিচিত্র বিকট রূপ সারা ভারতে কোথাও নেই।

দিল্লী থেকে যাত্রা করেছিলাম দক্ষিণগামী স্টেটবাসে। পুরোনো রেল স্টেশনের পাশ থেকে বাস ছেড়েছিল ভোরবেলা,—টিকেট কেটেছিলাম গোয়ালিয়র পর্যন্ত। বর্তমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের উত্তর সীমানা অতিক্রম করলেই গোয়ালিয়র। সেই গোয়ালিয়র থেকে এবারের মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ শুরু করব।

দিল্লী থেকে গোয়ালিয়র সাড়ে তিনশো কিলোমিটার। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে ছুঁয়ে যেতে হবে চারটি রাজ্য,—দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সর্বশেষে মধ্যপ্রদেশ। উদার মথুরা রোড ধরে দৌড় আরম্ভ। মথুরা আগ্রা ঢোলপুর ছাড়িয়ে এখন চম্বল নদী পার হচ্ছি।

গোড়া থেকেই খাতির জমিয়ে নিয়েছি ড্রাইভারের সঙ্গে। আসন পেয়েছি তার পাশেই। ঢোলপুরের স্টপেজে চা-সিগারেট খেয়েছি একসঙ্গে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—

চম্বলের সেই ডাকাতরা এখনো আছে নাকি?

ডাকু? কী বলেন বাবুজী? ডাকু নেই? ঢোলপুর থেকে মোরেনা পর্যন্ত এদেশ তো ডাকুদেরই রাজত্ব! ডাকুদের হটাবে কে?

কেন, সরকার? পুলিশের গুলিবন্দুক?

কী যে বলেন আপনি? দাঁত বার করে ড্রাইভার বললে,—

ওই দুধারের সব টিলা দেখছেন, অগুনতি টিলা, ওই টিলার পেছনে লুকোলে ডাকুকে খুঁজে পাবার সাধ্য কার? আর গুলিবন্দুক শুধু পুলিশের আছে, ডাকুর নেই?

সত্যিই চম্বলের ডাকুর নেই কী? প্রাকৃতিক আশ্রয় আছে, গুলিবন্দুক আছে, ধনসম্পত্তি আছে। সেই সঙ্গে আছে প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তি আর সামাজিক প্রতিপত্তি। তাদের নেতা মরেছে, সহনেতারা জেলে কয়েদ হয়েছে। পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের দল। খবরের কাগজে তাদের নামে ডঙ্কারব মৃদুমন্দ হয়েছে। কিন্তু তারা নিঃশেষ হয়নি। ওই সব টিলার পিছনে বন্দুক হাতে ঘাপটি মেরে ওই বুঝি তারা বসে আছে,—আর শ্যেনদৃষ্টি মেলে শিকারের সন্ধান করছে।

উত্তরে ঢোলপুর আর দক্ষিণে মোরেনা। মাঝখানে চম্বল নদী। নদীর এপার ওপার জুড়ে ডাকাতদের লীলাভূমি। মোরেনা থেকে কিলো বত্রিশ টানা বাস ছুটল গোয়ালিয়রের উদ্দেশ্যে।

স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

আমি ভারত-পথিক।

স্বদেশের প্রান্তে প্রান্তে আমি ঘুরে বেড়াই,—প্রদেশে প্রদেশে রাজ্যে রাজ্যে। চেনা পথে আর অচেনা পথে। নদী আর পর্বত, সমুদ্র আর কান্তার, শস্যক্ষেত্র আর মরুভূমি,—বিচিত্ররূপিনী ভারত-প্রকৃতির অবর্ণনীয় রূপ আমি নয়ন ভরে দেখে বেড়াই। কতো শহর, আর কতো গ্রাম, কালজয়ী কতো তীর্থ, আর ইতিহাসের কতো স্মৃতি-নিদর্শন আমার বিস্মিত চোখের সামনে ভাসে।

কী বৈচিত্র্যময়ী আমার জন্মভূমি! কতো জাতির পালয়িত্রী, কতো সংস্কৃতির লালয়িত্রী। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম প্রকাশ, মানব-ধর্মের পরমতম বিকাশ এই ভারত-জননীর কোলে। এই জননীর কতো শিশু কতো ভাষায় মা-মা বলে ডাকে।

এই জননীর কোলে আমিও জন্মগ্রহণ করেছি। প্রথম যেদিন কথা ফুটেছে, মা বলে তাকে ডেকেছি,—খেলা করেছি তার আঁচলের ছায়ায়। সেই খেলা এখনও খেলছি,—সেই রং-বাহার আঁচলের চোখ-ভোলানো কারুকার্য আজও অবাক হয়ে দেখছি। অবাক হয়ে আর ঘুরে ঘুরে—পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে।

এই ঘোরাঘুরির খেলা একদিন শেষ হবে কিন্তু দেখা সেদিনও বাকি থাকবে। চোখ একদিন বন্ধ হবে, কিন্তু বিস্ময় থাকবে অফুরাণ।

আমি একাকী পথিক,—কেউ ভেড়ে না আমার দলে, কেউ যাত্রা শুরু করে না আমার সঙ্গে। এক একবার যাত্রা শেষ করে যখন ফিরে আসি, ঘিরে ধরে আমাকে। নীড়ছাড়া পাখি অচেনা আকাশে অনেক উধাও সঞ্চরণের পর আবার খাঁচায় ফিরে এসেছে। ঘরের পাখিরা যেন তার নতুন বুলি শুনতে চায়। তেমনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুনতে চায় আমার ভ্রমণের গল্প।

শুনতে শুনতে মাথা নেড়ে বলে,—

যাই বলো, তুমি বড়ো স্বার্থপর। একলা একলা কবে পালালে কাউকে না বলে,—সঙ্গে নিলে না কেন আমাদের?

আমি মুচকি হেসে বলি,—

যদি নিতে চাইতাম যেতে আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়।

বেশ তো, এবার চলো। যাবে তো ঠিক?

কোথায় যাবে?

পুরী।

পুরী? সরু মোটা অনেক গলায় হাসি ফুটে ওঠে,—